শাইখ ইউসুফ আল-ক্বারাদাওয়ী রচিত "ফিক্‌হুল জিহাদ" এর পাঠ পর্যালোচনা (পর্ব-১)

রশীদ আল ঘান্নুশী

সমকালীন বিশ্বের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ শাইখ ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ীর অনন্য সাধারণ গ্রন্থ "ফিক্‌হুল জিহাদ" প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে। ১৪৩৯ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে তিনি জিহাদের ধারণাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। ড. রশীদ আল ঘানুশী ২০০৯ সালে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গ্রন্থটির উপর একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। জিহাদ বিষয়ে বিতর্কিত ধারণাগুলোকে স্বচ্ছ করতে এই বক্তব্যটি বেশ সহায়ক হবে ।
--- সম্পাদক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এই সম্মেলনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাধারার সবচেয়ে জটিল ও আলোচিত একটি বিধান, জিহাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে যা ইসলামি চিন্তা-কাঠামোতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। হাদীসের ভাষায় জিহাদ হচ্ছে, ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া ও সীমা এবং এমন একটি বিষয় যাকে ঘিরে ইসলামের ভেতর ও বাহির উভয় অবস্থান থেকেই বিস্তৃত মতপার্থক্য এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্রমবর্ধমান ভূমিকার প্রেক্ষিতে এইসব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়াও মুসলিম বিশ্বে ঈমান ও আমলের ক্ষেত্রে যে পুনর্জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিমদের নিজেদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সরকার ও অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এসব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব রয়েছে। এটিই ইসলামের ধর্মীয় দিক যা বিশ্বাস, আচারানুষ্ঠান ও নৈতিকতা সম্পর্কিত এবং আদর্শিক দিক যা মুসলিমদের সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার-রীতি ও চিন্তাধারাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে- এই দুয়ের মধ্যে বৃহত্তর সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেছে। ইসলামের এ আদর্শিক দিকটি রাজনৈতিক ইসলাম হিসেবেও পরিচিত যার কেন্দ্রবিন্দুতে কোন না কোনভাবে জিহাদের অবস্থান রয়েছে।

এ প্রবন্ধটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কেননা এটি এই জরুরী বিষয়ে এমন একজন ব্যক্তির মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছে যিনি সমসাময়িক ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন- তিনি হলেন শাইখ ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ী। আর এর সাক্ষ্য বহন করে বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর ভূমিকা। বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ের কথা বলতে গেলে, তাঁর লিখিত কর্মের সংখ্যা দেড়শ পেরিয়েছে যেগুলো ইসলামী চিন্তাধারার সমস্ত দিকগুলোকেই পরিবেষ্টিত করেছে। প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক ও ফিক্বহী কাউন্সিলগুলোতে সদস্য হওয়ার পাশাপাশি তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ মুসলিম স্কলারস-এর নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। এছাড়াও তিনি ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া এন্ড রিসার্চ ও বেশ কিছু দাতব্য সংস্থারও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সে সাথে তিনি অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজ সহ বেশ কিছু ইসলামিক স্টাডিজ একাডেমিক কমিটির সদস্য। আর ইসলামি আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি এর অন্যতম একটি দল মুসলিম ব্রাদারহুড-এর অভ্যন্তরে বেড়ে উঠেছেন এবং এতে নেতৃস্থানীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি মুসলিম ওয়েবসাইট ইসলাম অনলাইনকে পৃষ্ঠপোষকতা এবং আল-জাজিরা চ্যানেলে তাঁর জনপ্রিয় সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান শারীয়াহ্ ও জীবন, যা সপ্তাহে ৬০ মিলিয়ন দর্শক আকৃষ্ট করে, এর মাধ্যমে আধুনিক গণমাধ্যমেও একজন পরিচিত মুখ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন।

> সমসাময়িক ইসলামে আল-ক্বারাদাওয়ী একটি মুখ্য তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন যা থেকে তাঁর সমস্ত মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গী উৎসরিত হয় এবং যার দিকে তিনি অক্লান্তভাবে ডেকে যাচ্ছেন। বিরোধীদের অবস্থানকে সংকুচিত করে এই তত্ত্বের আবেদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি হচ্ছে ইসলামী ওয়াসাতিয়া বা মধ্যমপন্থার নীতি। এই চিন্তাটি কোরআনের দ্বিতীয় সূরার এই আয়াতটি দ্বারা অনুপ্রাণিত যেখানে বলা হয়েছেঃ "এবং এভাবেই আমরা তোমাদের মধ্যপন্থী জাতি হিসেবে তৈরী করেছি।"এভাবেই তিনি ইসলামকে পরস্পর বিপরীত ও সাংঘর্ষিক দুটো অনমনীয় অবস্থান যেমনঃ বস্তুবাদ ও আধ্যাত্মবাদ, ব্যক্তিবাদ ও সমষ্টিবাদ, ভাববাদ ও বাস্তববাদ ইত্যাদির মধ্যে মধ্যম অবস্থানের অধিকারী হিসেবে তুলে ধরেন যেটি সবকিছুকে সমন্বয় করে চলে। এই ওয়াসাতি বা মধ্যমপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি জিহাদের প্রশ্নসহ ইসলামী চিন্তাধারার সকল বিষয়ে নিজের ইজতিহাদ পেশ করে থাকেন যার দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর সর্বশেষ বই "জিহাদের ফিক্‌হঃ কোরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে এর আহকাম ও দর্শনের তুলনামূলক পর্যালোচনা"।

লেখকের মতে এই গবেষণাকর্ম টানা কয়েকবছরের পরিশ্রমের ফল যা তাঁর মনমানসকে ব্যস্ত রেখেছিল দশকের পর দশক ধরে। আর এই কাজের ফসলই একটি যুগান্তকারী দুই খন্ডের বই হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে। এতে তিনি ওয়াসাতি বা মধ্যমপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি পেশ করেছেন এবং জিহাদের উপর তাঁর নিজস্ব তত্ত্ব সুবিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছেন যা জিহাদের মত একটি গুরুতর বিষয়ে ঐক্যমত তৈরী করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। বইটি এ বিশ্বাস থেকেই উৎসরিত হয়েছে যে, "জিহাদকে ভুল বোঝা এবং এর নামে নিরীহ মানুষের রক্ত ঝরানো, সম্পত্তি ও জীবন বিনষ্ট করা এবং মুসলিমদের ও ইসলামকে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড ও সন্ত্রাসবাদের কলঙ্কে কলঙ্কিত করা বিপদজনক ও ত্রুটিপূর্ণ যখন প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এসব অভিযোগ থেকে মুক্ত। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এই গুরুতর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি ও উদাসীনতা এই দুই প্রান্তিকতার মাঝে সত্য হারিয়ে যায়।"

শাইখ ইউসুফ আল ক্বারাদাওয়ীর মতে ইসলামে জিহাদের যে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তার স্বচ্ছ একটি ধারণা তুলে ধরার দিকে এই যুগান্তকারী কাজটির উপর আমাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করবে। এই সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে কোরআন-সুন্নাহ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় তাফসীর ও ফিক্‌হ ঐতিহ্যের সাথে কোরআন-সুন্নাহর মিথস্ক্রিয়ার ভিত্তিতে এবং বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্যের মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক ও বাহ্যিক শক্তির সাথে বড় বড় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া মুসলিম উম্মাহর বর্তমান অবস্থা, স্বাধীনতার মূল্যবোধের জয়গান গাওয়া আধুনিক সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক আইনকে বিবেচনায় রেখে যে আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয় ও বৈধ যুদ্ধকে কেবল আত্মরক্ষার মধ্যে সীমিত করে দেয়। এইসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতেই জিহাদের ব্যাপারে আল-ক্বারাদাওয়ীর মতামত গঠিত হয়েছে। এই কাজের খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই বইটিতে অভিনব যেসব বিষয় রয়েছে, বিশেষ করে যেগুলো বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গের সাথে সম্পর্কিত যেমনঃ স্বাধীনতার সাথে জিহাদের সম্পর্ক, মুসলিম ও অন্যান্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর এর প্রভাব, জিহাদ কি মুসলিম সমাজের মধ্যে নাকি বাহিরে সংঘটিত হবে, এসবের সাধারণ একটি চিত্র তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। অতএব, এই কর্মপন্থার ভিত্তিসমূহ কি? জিহাদ কি? জিহাদের রূপসমূহ কি কি? এর উদ্দেশ্যসমূহ কি কি? এটি আত্মরক্ষামূলক নাকি আক্রমণাত্মক? এটি কি দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরের মধ্যে? যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম কি? উম্মাহ্‌র মধ্যে কি জিহাদ আছে? উম্মাহ্‌র চলমান পরিস্থিতিতে জিহাদের অবস্থান কোথায়?

১) কর্মপন্থা বিষয়ক প্রশ্নঃ

প্রারম্ভিক ভূমিকাতেই লেখক তাঁর গবেষণার ভিত্তি ও বুনিয়াদ নিরূপণ করেছেনঃ

ক) চূড়ান্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ গ্রন্থ হিসেবে কোরআনের উপর ভরসা করা যেটি রাসূলের সুন্নাহসহ অন্যান্য উৎসসমূহ বিচারের মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে। কোরআনকে বুঝতে হবে এরমূল ভাষা আরবী দিয়ে, বাইরে থেকে অর্থ চাপিয়ে দিয়ে নয় এবং এটির উপর ভিত্তি করে যে কোরআনের সব আয়াতই বাস্তবায়ন করার জন্য নাযিল হয়েছে "তাই আমি সবিস্তারে তাদের দাবী নিয়ে প্রশ্ন তুলেছি যারা বলে থাকেন, কোরআনে আয়াত আস-সাইফ (তলোয়ারের আয়াত) বলে একটি আয়াত রয়েছে যা তাদের দাবী অনুযায়ী ১৪০টি বা তার চেয়েও বেশী আয়াত রহিত করেছে, যদিও এই আয়াত কোনটি তা নিয়েই তাদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান।" লেখক বলতে গেলে কোরআনের আয়াত রহিতকরণের মূলনীতিকেই বাতিল সাব্যস্ত করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি চরমপন্থীদের একটি কার্যকর অস্ত্র থেকে বঞ্চিত করেছেন যেটা দ্বারা তারা শত শত আয়াতকে অকার্যকর রেখেছে যেগুলো দয়া, ক্ষমাশীলতা, অমুসলিমদের সাথে প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আচরণ করা এবং অমুসলিমদের মধ্যে সংখ্যালঘু অংশ যারা অন্যায়-অবিচার করে তাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক জিহাদ করা যেতে পারে ও শান্তিপূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যারা সুবিচার এবং

দয়াশীলতার অধিকারী- এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে বলে।

খ) সহীহ সুন্নাহর উপর নির্ভর করা যা এর চেয়ে শক্তিশালী উৎস কোরআনের সাথে সাংঘর্ষিক না। সেজন্যই লেখক হাদীসশাস্ত্রের মানদণ্ড ব্যবহার করে আমাকে তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছেএবং তদ্রুপ অন্যান্য হাদীসসমূহকে দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তিনি অন্য একটি সহীহ হাদীস, যেটিতে মানুষ লা ইলাহা ইল্লাহ বলা না পর্যন্ত তাদের সাথে লড়াই করার জন্য বলা হয়েছে, ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে যে হাদীসে ব্যবহৃত মানুষ শব্দটি কেবল শত্রু মনোভাব সম্পন্ন আরব মুশরিকদের জন্য নির্দিষ্টভাবে প্রযোজ্য।

গ) কোন একটি নির্দিষ্ট মাযহাবের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট না হয়ে কিংবা প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর কোন একটিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে তুলনামূলক আইনের পদ্ধতি, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সবচেয়ে উপযুক্ত মত গ্রহণের ভিত্তিতে ফিক্‌হের সমৃদ্ধশালী ঐতিহ্য থেকে লাভবান হওয়া। লেখক ফিক্‌হ এবং শরীয়াহর মধ্যে পার্থক্য করেন এভাবে যে, শরীয়াহর উৎস স্বয়ং আল্লাহ্‌ যেখানে ফিক্‌হ হচ্ছে শরীয়াহর হুকুমে উপনীত হওয়ার জন্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টার ফল। প্রকৃত ফিক্‌হ সেটা নয় যা কোন বই থেকে হুবহু নকল করা হয়। বরং তা হচ্ছে ফক্বীহর নিজস্ব ইজতিহাদ (বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা) যা তাঁর সময় ও স্থানের জন্য উপযোগী। বিশেষ করে আমাদের সময়ের জন্য তো এটি আরো বেশী প্রযোজ্য যখন বড় বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে।

ঘ) ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্ম ও আইন ব্যবস্থাসমূহের তুলনা করা।

ঙ) বর্তমান বাস্তবতার সাথে ফিক্‌হকে সম্পর্কযুক্ত করাঃ মুসলিম ফক্বীহ যখন জিহাদ সম্পর্কে কথা বলবেন তখন তাঁকে এর অপরিবর্তনীয় মূলনীতিগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে যেমনঃ তাদাফুর নীতি (পারস্পরিক নিবৃত্তিকরণ), শত্রুকে প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সবধরনের শক্তিকে প্রস্তুত রাখার হুকুম, মুসলিমদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধের সূচনা করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সীমালঙ্ঘন করা নিষিদ্ধ হওয়া ইত্যাদি। তবে অন্য বেশ কিছু বিষয়েরও আবির্ভাব ঘটেছে (যেগুলোকে মুতাগায়্যিরাত বা পরিবর্তনীয় উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়) যেমনঃ যুদ্ধকে নিন্দা করা, শান্তি তালাশ করা, আন্তর্জাতিক আইনের আবির্ভাব, মানবাধিকার ধারা, জাতিসংঘ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি। এ বিষয়ে লেখকের বক্তব্য হচ্ছে, ইসলামের ছায়াতলে থেকে আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বসবাস করতে পারি যা ভীতির পরিবর্তে শান্তি ও নিরাপত্তা, গোঁড়ামীর পরিবর্তে সহিষ্ণুতা, ঘৃণার পরিবর্তে ভালোবাসাকে উৎসাহিত করে। আমরা জাতিসংঘ, আন্তর্জাতিক আইন, মানবাধিকার ধারা, পরিবেশবাদী দলগুলোর সাথে সহাবস্থান করতে পারি। সত্যিকার অর্থে, আমাদের অনমনীয় ভাইয়েরা যারা সব দরজা বন্ধ করে কেবল একটি মতের উপরেই জোর দিচ্ছেন, তাদের সাথে আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে, তারা অতীতে বসবাস করছেন, বর্তমানে না; বইয়ের জগতে বসবাস করছেন, বাস্তবজগতে নয়।

চ) দাওয়াহ, শিক্ষা, ইফতা (ফতোয়া দেয়া), গবেষণা, সংস্কার এবং পুনর্জাগরণের ক্ষেত্রে ওয়াসাতিয়া বা মধ্যমপন্থা অনুসরণ করা। ফিক্‌হে এ কর্মপন্থার মূলনীতি হল আমাদের পূর্ববর্তী আলেমরা তাদের সময়ের জন্য যেমন ইজতিহাদ করেছেন, তেমনি আমাদের সময়ের জন্যও নতুন ইজতিহাদ করা, গৌণ উৎসগুলোকে প্রাথমিক উদ্দেশ্যসমূহের (মাকাসিদ) আলোকে বোঝা, মূলনীতিসমূহে (উসূল) দৃঢ় ও শাখাসমূহে (ফুরু) নমনীয় থাকা। উৎস যাই হোক না কেন তা থেকে প্রজ্ঞা আহরণ করা ও দ্বীনের মূলনীতি ও সমকালীন পরিবর্তনসমূহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার মাধ্যমে দ্বীনকে ভেতর থেকে পুনরুজ্জীবিত করা।

ছ) ফিক্‌হ আল-জিহাদ পড়ার সময় যে কারোরই চোখে পড়বে যে, লেখক যেন উপরে বর্ণিত মতামতসমূহের একমাত্র প্রস্তাবক হিসেবে বিবেচিত না হোন সেদিকে খেয়াল রেখেছেন। তিনি খুব আগ্রহের সাথে নিজ মতের সমর্থনে অতীত এবং সমকালীন আলেমদের মতামত তুলে ধরেছেন যদিও সেগুলো উপেক্ষিত ও অনাদৃত হয়ে থাকে। সেসব অবহেলিত মতামতসমূহের উপর জমে থাকা ধূলির আস্তর সরিয়ে সেগুলোর উপর আলোকপাত করেছেন, সেগুলোকে আরো আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি ঐসব মতসমূহকে নতুন জীবন দান করেছেন। এছাড়াও লেখক ইসলামী সংস্কৃতির উৎসসমূহের উপর তাঁর গভীর জ্ঞান ও আধুনিক সংস্কৃতির সাথে নিজ পরিচিতিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক সংস্কৃতির মধ্য থেকে প্রাসঙ্গিক মূল্যবোধ এবং বিশেষজ্ঞ মতামতকে নিজ মতের সমর্থনে পেশ করেছেন। এভাবে তিনি ইসলামিক জিহাদের একটি সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণ করেছেন যা অভিনব, আভ্যন্তরীণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ, ইসলামী ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত এবং যুদ্ধ ও শান্তির ব্যাপারে সমকালীন সংস্কৃতির সাথে যার বিশাল অংশের মিল রয়েছে। এই বইয়ের নতুনত্ব এর খুঁটিনাটি বিষয়সমূহে নয় কারণ এর অংশসমূহ তো এর ভেতরে ছড়ানো ছিটানো ও লুকায়িত আছে। এর অভিনবত্ব বরং এর সামগ্রিকতায় যা একে এমন এক মিলন ও ঐক্যমতের বিন্দুতে পরিণত করেছে যেখানে সব অথবা বেশীরভাগ পক্ষই পরিচিত এমন কিছু খুঁজে পাবে যা তাদেরকে অপরিচিত বিষয়সমূহকে গ্রহণ করতে সাহায্য করবে। ঐক্যমত গড়ে তোলার এই সক্ষমতা বড় আলেমদের একটি ঐতিহ্যবাহী বৈশিষ্ট্য। তাই লেখক যখন ফক্বীহ, আইনজীবী, ইসলামপন্থী, ইতিহাসবিদ, প্রাচ্যবিদ, কূটনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সামরিক ব্যাক্তিত্ব এবং শিক্ষিত জনগণের মধ্যে এ ধরনের

গবেষণাকর্মের ভীষণ প্রয়োজন বলে অভিহিত করেন তখন তাতে একটুও অতিরঞ্জন করেন নি।

২) জিহাদের মর্ম এবং এর রূপসমূহঃ

ইসলামের কোন বিষয়ই জিহাদের মত এরকম লাগাতার সমালোচনার শিকার হয় নি এবং ইসলাম ও মুসলিমদের উপরও এরূপ অবিরাম আক্রমণের কারণ হয় নি। জিহাদ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি এই দুই প্রান্তিকতার শিকার। পরের অবস্থানটির ব্যাপারে এমন দল উৎসাহ প্রদান করে যারা বশ্যতা ও আত্মসমর্পণের মানসিকতা ছড়ানোর মাধ্যমে উম্মাহর জীবন থেকে জিহাদের অবসান চায়। একাজে তারা সহিষ্ণুতা, শান্তিসহ বিভিন্ন আহবানের ছদ্মবেশ ব্যবহার করে থাকে। লেখক এই দলগুলোকে উপনিবেশবাদের দালাল হিসেবে অভিহিত করেছেন। এদের জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে যে, এরা জিহাদবিহীন ইসলামের প্রবর্তন করেছে এবং এর প্রচার প্রসারে আত্মনিয়োগ করেছে। এই দলগুলোর মধ্যে রয়েছে বাহাই এবং কাদিয়ানী। আরেক প্রান্তে অবস্থান করছে একদল যারা জিহাদকে একটি উন্মত্ত যুদ্ধের ধারণায় পরিণত করেছে যা গোটা বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়া হয়। অমুসলিমদের সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ককে শত্রুতায় পর্যবসিত করেছে। সব মানুষই তাদের মতে শত্রু যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা মুসলিম হচ্ছে। পরের দলটি প্রাচ্যবিদদের দেয়া জিহাদের সংজ্ঞার সাথে একমত হতে পারে যেমন কিনা “এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম”-এ দেয়া আছেঃ “তরবারীর মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার করা, যেটি সব মুসলিমের উপর আবশ্যক এবং ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ।” (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ ইসলাম, আরবী অনুবাদ, পৃঃ ২৭৭৮)

লেখক উভয় দলের চরমপন্থাকে খন্ডন করেছেন “জিহাদ”, যার অর্থ মূলত নিজে সচেষ্টা হওয়া এবং প্রচেষ্টা চালানো, এ শব্দটির ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং কোরআন-সুন্নাহতে ও মুসলিম ফক্বীহদের দ্বারা এ শব্দের ব্যবহার পরীক্ষা করার মাধ্যমে। তিনি এ উপসংহারে এসেছেন যে, জিহাদ এবং ক্বিতালের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে, কেননা জিহাদে অংশগ্রহণ করার আদেশ মক্কায় নাযিল হয়েছিল যেখানে কোন লড়াই ছিল না, বরং ছিল কোরআনের মাধ্যমে দাওয়াতের জিহাদ। “এবং তাদের সাথে এর সাহায্যে কঠোর জিহাদ করুন।” [কোরআনঃ ২৫:৫২] (পৃষ্ঠা ৫০-৫২)

এ শব্দটি কোরআন ও সুন্নাহতে বিভিন্ন প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেমনঃ শত্রুবাহিনী, শয়তান এবং স্বীয় কামনা-বাসনা ইত্যাদি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। তাই, “জিহাদ” শব্দটি কেবল “লড়াই”-এর চাইতে প্রশস্ত অর্থ বহন করে, যার সমর্থনে লেখক ইবনে তাইমিয়াহ থেকে উদ্ধৃতি দেন, “(জিহাদ) হতে পারে হৃদয় দিয়ে, ইসলামের দিকে আহবান করার মাধ্যমে, ভুল মতকে খণ্ডন করার মাধ্যমে, মুসলিমদের কল্যাণ বয়ে আনে এমন কিছুর উপদেশ বা এর ব্যবস্থা করার মাধ্যমে অথবা নিজের দেহের মাধ্যমে তথা লড়াইয়ের মাধ্যমে।”

এছাড়াও জিহাদের ব্যাপ্তি যে আরো প্রশস্ত তা পরিষ্কার করতে লেখক নিজ সমর্থনে চতুর্দশ শতাব্দীর আলেম, ইবনে তাইমিয়াহর ছাত্র ইবনিল ক্বায়্যিমকেও উদ্ধৃত করেন। এ পরিসরে প্রত্যেক মুসলিমই একজন মুজাহিদ কিন্তু অপরিহার্যভাবে মুক্বাতিল (লড়াইকারী) নয়। ইবনিল ক্বায়্যিম ইসলামী দাওয়াহর উপর তাঁর গবেষণা থেকে এ উপসংহারে আসেন যে, জিহাদের ১৩টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে জিহাদ আন নাফস (নিজের সাথে জিহাদ) যাতে চারটি স্তর অন্তর্ভুক্ত। সেগুলো হচ্ছেঃ হেদায়াত অনুসন্ধান করা, এর উপর আমল করা, এর দিকে আহবান করা, এর উপর অটল থাকা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ যাতে রয়েছে দুটি স্তরঃ শয়তান একজনের ঈমানে যেসব সন্দেহ উস্কে দিয়ে থাকে সেগুলোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং শয়তান যেসব কামনা-বাসনা ও বিকৃতির দিকে আহবান করে সেগুলোকে প্রতিরোধ করা। তৃতীয়ত, অমুসলিম এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ যা চারটি স্তরে বিভক্তঃ হৃদয়, জিহবা, সম্পদ এবং নিজের জীবনের মাধ্যমে জিহাদ। চতুর্থত, অত্যাচারী এবং নীতিহীনদের বিরুদ্ধে জিহাদ যেটির রয়েছে তিনটি স্তরঃ হাত দ্বারা জিহাদ যদি তা সম্ভব হয়, যদি সম্ভব না হয় তবে জিহবা দ্বারা জিহাদ, যদি সেটাও সম্ভব না হয় তবে হৃদয়ের মাধ্যমে জিহাদ। অবশ্য লেখক ইবনিল ক্বায়্যিমের সাথে মতভিন্নতা পোষণ করে অত্যাচারী ও নীতিহীনদের বিরুদ্ধে জিহাদকে কুফর এবং বহির্শক্তির আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের আগে স্থান দিয়েছেন। সেইসাথে এটাও জোর দিয়ে বলেছেন যে, “অন্যায় শাসকের মোকাবেলা করার জন্য অন্যরা যেসব যৌক্তিক উপায়-উপকরণ উদ্ভাবন করেছে যেমনঃ নির্বাচিত পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল ও ক্ষমতার পৃথকীকরণ- সেগুলোর ফায়দা নেয়া যেতে পারে” (পৃষ্ঠা ১৯৮) এবং এর মাধ্যমে অত্যাচারীদের শান্তিপূর্ণভাবে মোকাবেলা করতে হবে।

লেখক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক জিহাদের উপরেও জোর দিয়েছেন যা হবে “বিশেষজ্ঞদের জন্য ইসলামি একাডেমিক সেন্টার

প্রতিষ্ঠা ও ব্যতিক্রমী তরুণদের শিক্ষায়তনিক ও নৈতিকভাবে গড়ে তোলার মাধ্যমে। এটি তাদের এমন কর্মপন্থার উপর ভিত্তি করে নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রস্তুত করবে যা আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও আধুনিকতাকে সমন্বয় করবে... বাকি বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দিকে আহবান আমরা করি না। আমরা বরং সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার পারস্পরিক আদান-প্রদানের দিকে আহবান করি। আমরা কি নিব আর কি নিব না সেটা আমরা সিদ্ধান্ত নিব আমাদের নিজস্ব দর্শন ও মাপকাঠির ভিত্তিতে, যেমন কিনা অতীতে তারা আমাদের চিন্তা ও উদ্ভাবন থেকে ধার নিয়ে সেগুলোকে আরো বিকশিত করেছে ও তা ব্যবহার করে নিজেদের সভ্যতা বিনির্মাণ করেছে। আমরা যা নিব তা আমাদের চিন্তা-চেতনা, বৈশিষ্ট্য ও নৈতিক ঐতিহ্য দ্বারা এমনভাবে অনুপ্রাণিত হবে যে সেগুলো নিজেদের প্রারম্ভিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক ব্যবস্থার অংশে পরিণত হবে। (পৃষ্ঠা ১৯০-১৯২)

লেখক ইসলামে জিহাদের ফিক্‌হের উপর তাঁর গবেষণা থেকে এ উপসংহারে এসেছেন যে, জিহাদ দু প্রকারঃ বেসামরিক জিহাদ এবং সামরিক জিহাদ। সামরিক জিহাদ হচ্ছে মুসলিমদের উপর আক্রমণকারী শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। যার জন্য জরুরী হচ্ছে যখন এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে তখন প্রস্তুতি নেয়া। এটি রাষ্ট্রের আওতার মধ্যে পড়ে। আর রূহানী বেসামরিক জিহাদশিক্ষায়তন, বিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশ এবং সভ্যতার ক্ষেত্রকে পরিবেষ্টন করবে। বেসামরিক জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর জন্য সর্বোচ্চ আত্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে অজ্ঞ ব্যক্তিকে শিক্ষার আলো দেওয়া, বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া, ক্ষুধার্তকে আহার দেওয়া, বস্ত্রহীনকে পোশাক দেওয়া, গৃহহীনদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা, অসুস্থকে সেবা করা, দরিদ্রদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, ছাত্রদের জন্য স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা, নামাযীদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা, ক্রীড়াচর্চা করতে যারা ভালোবাসে তাদের জন্য ক্লাব নির্মাণ করা যাতে তারা তাদের ক্রীড়া চর্চা করতে পারে।

৩। জিহাদের উদ্দেশ্য

ইসলাম শান্তির দিকে একটি আহবান। এটি যুদ্ধকে ঘৃণা করে কিন্তু যুদ্ধ একটি বাস্তবতা। সেজন্যই ইসলাম যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু এর উপর চাপিয়ে দেয়ার আগ পর্যন্ত ইসলাম যুদ্ধ শুরু করে না। এর কারণ ইসলামের বাস্তববাদী প্রকৃতি এবং সুন্নাহ আল-তাদাফুর (পারস্পরিক নিবৃত্তকরণ নীতি) প্রতি খেয়াল রাখা। যদিও ইসলাম বিভিন্ন নিয়ম-নৈতিকতার মাধ্যমে এর পরিণতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করেছে। ইসলাম প্রয়োজনের খাতিরে যুদ্ধকে স্বীকৃতি দিয়ে খ্রিষ্টধর্মসহ অন্যান্য ধর্মের চেয়ে আলাদা কিছু করেনি। খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা তো নিজেদের মধ্যে এবং অন্যের সাথে সবচেয়ে বেশী যুদ্ধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। লুকের বাইবেলে আছে, আমি পৃথিবীতে আগুন নিয়ে এসেছি। তোমরা কি মনে করেছো আমি পৃথিবীতে শান্তি নিয়ে এসেছি? সাতটি জনগোষ্ঠী যারা ফিলিস্তিনের অধিবাসী ছিল তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্যবার গণহত্যার মাধ্যমে পুরোপুরি নির্মূলের নির্দেশ এসেছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। যেন আধুনিক যায়োনিষ্ট গ্যাঙ্গদের দ্বারাস্থানান্তরএর অধুনা আহবান ও তাদের কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা যেন ওল্ড টেস্টামেণ্টের সে নির্দেশেরই ক্ষুদ্র রূপ।

ইসলামে জিহাদের কিছু নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে যেগুলোকে আল ক্বারাদাওয়ী এভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেনঃ সীমালংঘনের জবাব দেয়া, ফিতনা প্রতিরোধ করাতথা মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, নির্যাতিতদের রক্ষা করা, চুক্তি ভঙ্গকারীদের শাস্তি দেয়া এবং উম্মাহ্‌র মধ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি নিশ্চিত করা। তাই সীমানা বিস্তৃতি ও ধনসম্পদ কব্জা করা জিহাদের উদ্দেশ্য নয় এমনকি নয় কুফরের নিশ্চিহ্নকরণও; কারণ, তা পার্থক্য ও পারস্পরিক নিবৃত্তকরণের (তাদাফু) আল্লাহর নীতির বিরুদ্ধে যায়। যারা ইসলামে বিশ্বাস করে না তাদের উপর ইসলাম চাপিয়ে দেয়াও জিহাদের উদ্দেশ্য নয় কেননা তা আল্লাহর বেঁধে দেয়া বৈচিত্র্য ও বহুত্বের নীতির বিরুদ্ধে যায়। (পৃষ্ঠা ৪২৩)

লেখাটি মূলত ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ এ এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি ভাষণ থেকে অনূদিত।

সূত্রঃ VirtualMosque.com

দ্বিতীয় পর্বঃ শাইখ ইউসুফ আল-ক্বারাদাওয়ী রচিত "ফিক্বহুল জিহাদ" এর পাঠ পর্যালোচনা

রশীদ আল ঘান্নুশী

তিউনিশিয়ার প্রধান ইসলামী দল আন-নাহদা এর প্রতিষ্ঠাতা ও এর বুদ্ধিবৃত্তিক নেতা